বিশেষ প্রতিবেদন

সাদ্দাম
বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব

কিছুদিন ধরে লাদেনের নিচে চাপা পড়েছিলেন সাদ্দাম। বুশের ইরাক আগ্রাসন তাকে আবার নিয়ে এসেছে আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে। এ মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি সাদ্দাম... লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

রাষ্ট্র ক্ষমতায় জেনারেল আবদুল করিম কাশেম। পরিকল্পনা করা হলো তাকে হত্যার। এই হত্যা পরিকল্পনার হিটম্যানদের একজন তিনি। কাশেমের ওপর আক্রমণ ব্যর্থ হলো। কাশেমের নিরাপত্তা রক্ষীদের ছোঁড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে টাইগ্রিস নদী সাঁতরে মেষপালকের ছদ্মবেশে সিরিয়া পালিয়ে গেলেন তিনি। যার কথা বলছি তিনি এখন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব, ইরাকের রাষ্ট্রপ্রধান সাদ্দাম হোসেন।

২০ মার্চ ইঙ্গ-মার্কিন জোট যেদিন ইরাক আগ্রাসন শুরু করলো, সেদিনই ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছেন সাদ্দাম। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে উৎখাত করতে বৃহৎ শক্তির জোট যুদ্ধে নেমেছে, এমন নজির আরেকটি নেই। সাদ্দামের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের যুদ্ধ চলছে জোরেশোরে। অন্যদিকে অকুতোভয় সাদ্দাম শত্রুর সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে দিব্যি বেঁচে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, বীরদর্পে লড়ে যাওয়া ইরাকিদের উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন সাদ্দাম।

মানুষ বীর পূজারি। বিশেষত দুর্বল মানুষ সবসময় নিজের অক্ষমতা ভুলতে বীরের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাকে সমর্থন যোগায়। এ মুহূর্তে সাদ্দামের ক্ষেত্রে কথাটি শতভাগ খাঁটি। সাদ্দামের যতো দোষই থাক, তৃতীয় বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমের বিরুদ্ধে মাটি কামড়ে লড়ে যাওয়া সাদ্দামের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে সেই বীরের ছায়া। অন্যদিকে মুসলমানরা সাদ্দামের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে এক আরব বীরকে, যিনি খ্রিস্টান শক্তির ক্রুসেডের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যে যেভাবেই দেখুক, সাদ্দাম এখন বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আরব যোদ্ধা।

সাদ্দাম সত্যিই এতটা বীরশ্রেষ্ঠের মর্যাদা পাবার যোগ্য কিনা তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক থাকতে পারে। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ বেশকিছু শক্তিশালী পশ্চিমা দেশের চোখে সাদ্দাম একজন স্বৈরাচারী, যুদ্ধবাজ, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী। পশ্চিমা মিডিয়া

প্রতিনিয়ত সাদ্দামের ভাবমূর্তি ধ্বংসের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাদ্দামকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে নানারকম মিথ, যার অধিকাংশ তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। যেমন '৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের পর প্রচার করা হয়েছিল সাদ্দাম নপুংসক। তার সন্তান পরিচয়দানকারীরা তার সন্তান নয়। যুদ্ধ শুরুর মাসখানেক আগে মার্কিন টিভিতে এক মহিলাকে হাজির করে বলা হয় তিনি সাদ্দামের রক্ষিতা। এছাড়া সাদ্দামের নৃশংসতা নিয়ে বহু কেচ্ছাকাহিনীও প্রচারিত হয়েছে পশ্চিমা মিডিয়ায়। শুধু সাদ্দামই নয়, তার দুই ছেলে উদে আর কুশেকে নিয়েও বিভিন্ন মুখরোচক গল্প প্রচার করেছে এসব মিডিয়া। পশ্চিমা মিডিয়ার শক্তিশালী প্রচারণার কারণে সত্যিকার সাদ্দামকে খুঁজে পাওয়া দুরূহ।

সাদ্দামকে যারা কাছে থেকে দেখেছেন, তারা বলছেন ভিন্ন কথা। সাদ্দামের জীবনী লেখক সাঈদ কে. আবুরিশের মতে, 'সাদ্দাম হোসেন বিশ শতকের সবচেয়ে নিয়মতান্ত্রিক আরব নেতা। তিনি সংগঠিত। তিনি দিবাস্বপ্ন দেখেন ঠিকই কিন্তু সেটা বাস্তবায়নের ক্ষমতাও তার রয়েছে। তিনি জনপ্রিয়। তিনি দক্ষ পরিকল্পনাকারী এবং তিনি মধ্যপ্রাচ্যে এতটা প্রভাব রেখেছেন যে আমাদের প্রয়োজন তাকে জানা।'

আবুরিশ হয়তো খানিকটা বাড়িয়েই বলেছেন, কিন্তু সাদ্দামের মধ্যে আরব বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার সবরকম ক্ষমতাই ছিল। '৬০ ও '৭০-এর দশকে তার হাত ধরেই ইরাক আধুনিকতার পথে এগিয়ে যায়। বাথ সোস্যালিজমের নামে তিনি কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করেন। এ কথা ঠিক যে, ক্ষমতা সুসংহত করতে তিনি বিরোধী নেতা-কর্মীদের ওপর দলন-পীড়ন চালান। পাশাপাশি এ কথাও স্বীকার করতে হবে, দেশবাসীকে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি উপহার দিয়ে তিনি তাদের মন জয় করেছিলেন। '৭০ দশকে ইরাকের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯ শতাংশের ওপরে। এ সময় বেকার ভাতা, বৃদ্ধ ভাতা, বিনা বেতনে উচ্চ শিক্ষা, মোটা অঙ্কের বেতনসহ কল্যাণ রাষ্ট্রের সবরকম সুযোগ-সুবিধা তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের দুয়ারে। ইরাকের এই সমৃদ্ধি শুধু ইরাকেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশও ইরাকের কারণে নিজেদের অর্থনীতি চাঙা করতে সক্ষম হয়। '৭০ দশকে প্রতিবেশী আরব দেশের ২০ লাখ শ্রমিক ইরাকে কাজ করতো। অন্যদিকে আরব দেশগুলোর মধ্যে ইরাকেরই ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কর্মদক্ষ আমলাতন্ত্র এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী। ইরাকের নারীরা ছিল আরব বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর। ১৯৮০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শিক্ষকের ৪৬ ভাগ ছিল নারী, শৈল্যচিকিৎসকদের ২৯ ভাগ, ডেন্টিস্টদের ৪৬ ভাগ, ফার্মাসিস্টদের ৭০ ভাগ, হিসাবরক্ষকদের ১৫ ভাগ, ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের ১৪ ভাগ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ১৬ ভাগ ছিল নারী। অন্য আরব দেশগুলোর চোখে ইরাক ছিল মডেল। আর এর সবটাই সম্ভব হয়েছিল সাদ্দামের কল্যাণে। উপরন্তু, ইরাকের মতো বহুজাতি বিভক্ত একটি দেশকে অখন্ড রাখতে পারাটাও তার বড় কৃতিত্ব। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশ্লেষকদের মতে, সাদ্দাম ছাড়া উত্তরের বিদ্রোহী কুর্দি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়াদের একত্রে নিয়ে অখন্ড ইরাকের ধারণা কল্পনাতেও আসে না।

পশ্চিমের সঙ্গে সাদ্দামের আগাগোড়া সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে মনে হতে পারে, সাদ্দাম পশ্চিমের ক্রীড়নক। কিন্তু গভীরে গেলে দেখা যাবে, পশ্চিম যেমন সাদ্দামের বন্ধু ছিল না, তেমনি সাদ্দামও পশ্চিমকে বন্ধু হিসেবে নেননি। সাদ্দামের জীবনী লেখক সাঈদ কে. আবুরিশ ফ্রন্টলাইন পত্রিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সাদ্দামের সঙ্গে পশ্চিম তথা আমেরিকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে- 'দু'জনের মধ্যে এক ধরনের ঘৃণা-ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। সাদ্দাম আমেরিকান প্রযুক্তি ভালোবাসতেন। আর তা যেভাবেই হোক পেতে চাইতেন। তার কেরিয়ারের খুব গোড়ার দিকেই তিনি বুঝতে পারেন, তিনি যেসব বিশেষ প্রযুক্তি চান তা কেবল আমেরিকাই যোগান দিতে পারে। তাই আমেরিকার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল, ঝোঁক ছিল। পাশাপাশি

ইরাকের সাধারণ জনগণ মার্কিন আগ্রাসন মোকাবিলায় প্রস্তুত

'৯১-এর মত এবারও সাদ্দাম নাম রাখার ধুম পড়েছে

সাদ্দামের হিরো স্ট্যালিন, ভাস্কর্যটিও তারই অনুকরণে

হাস্যোজ্জ্বল সাদ্দাম : এই হাসি কি চিরস্থায়ী হবে?

তিনি রাজনৈতিকভাবে আমেরিকাকে বিশ্বাস করতেন না।'

রাজনৈতিকভাবে আরব বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার সব ক্ষমতা ছিল সাদ্দামের ইরাক। বিশেষত '৭২ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদাল নাসের মারা যাওয়ার পর আরব বিশ্বে নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। নাসের ছিলেন আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। তিনি সবগুলো আরব দেশকে একই রাজনৈতিক প্লাটফর্মে আনতে চেয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা সামরিক যেকোনো বিবেচনায় ইরাক মিশরের স্থান পূরণে সক্ষম ছিল। সাদ্দাম সেই সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট। যৌবনে মিশরে নির্বাসনে থাকাকালে নাসেরের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গেও সাদ্দামের পরিচয় ঘটেছিল। এছাড়া নাসেরের রাজনৈতিক উত্থানের সঙ্গে সাদ্দামের নিজের কেরিয়ারেরও অসম্ভব মিল ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সাদ্দাম সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর বেশি জোর দিতে গিয়ে এবং পরবর্তীতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধে জড়িয়ে সাদ্দাম নিজের ও দেশের সর্বনাশ করেছেন। নাসের ১৯৫৪ সালে তার Philosophy of the Republic বইতে লিখেছিলেন, 'বীরোচিত এবং মহত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো কখনোই পালন করার মতো বীরের খোঁজ পায়নি।' দক্ষ সংগঠক এবং কষ্টসহিষ্ণু নেতা হওয়া সত্ত্বেও সাদ্দাম আরব বিশ্বের নেতৃত্বের সুযোগ হেলায় হাতছাড়া করেছেন।

কিন্তু সাদ্দাম যে ফুরিয়ে যাননি তার প্রমাণ চলমান যুদ্ধ। টেলিভিশনে সাদ্দামের দেশরক্ষার ডাক উপেক্ষা করতে পারেনি ইরাকের জনগণ। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম একে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছে ঠিকই কিন্তু সাদ্দাম হোসেন যে সত্যিই ইরাকের অদ্বিতীয় নেতা, এই সত্যকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা কারোরই হবে না।

কে এই সাদ্দাম হোসেন

১৯৩৭ সালে ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় নগরী তিকরিতের কাছে আল-আউজা গ্রামে জন্ম সাদ্দামের। জন্মের পর তার পিতা নিরুদ্দেশ হন, মা গ্রহণ করেন দ্বিতীয় স্বামী। ১০ বছর বয়স পর্যন্ত তার শিক্ষার কোনো বন্দোবস্ত করেননি সাদ্দামের সৎপিতা। মূলত মামা খায়রুল্লাহ তুলফার তত্ত্বাবধানে সাদ্দামের লেখাপড়ায় হাতেখড়ি। তখন কে জানতো যে এই সাদ্দামই হবেন আজকের

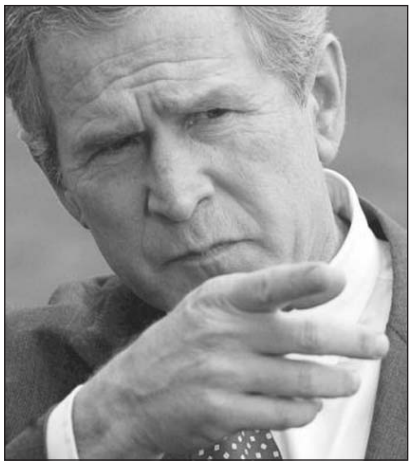

বুশের পারিবারিক শত্রু সাদ্দাম

দোর্দন্ড প্রতাপে ইরাক শাসন করা প্রেসিডেন্ট! অবশ্য মামা তুলফা সাদ্দামের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করেন। খায়রুল্লাহ তুলফা নিজেও ছিলেন ইরাকি সেনাবাহিনীর অফিসার। আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মামা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুফলের সঙ্গে পরিচিত করান সাদ্দামকে। ব্রিটেনের পুতুল রাজা ফয়সাল তখন ইরাকের ক্ষমতায়। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবরণও করেন তুলফা।

মামার পরামর্শেই বাগদাদে কলেজে পড়ার সময় আরব বাথ সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন সাদ্দাম। সে সময় তার বয়স ১৯ বছর। ১৯৫৮ সালে রাজা দ্বিতীয় ফয়সালকে হত্যা করে ক্ষমতায় বসেন জেনারেল আবদুল করিম কাশেম। কাশেম ছিলেন ইরাকের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সেনানি। উপ-প্রধানমন্ত্রী হন আবদুস সালাম আরিফ। জেনারেল কাশেম ছিলেন কম্যুনিস্টপন্থি। এ সময় বাথ পার্টি থেকে কাশেমকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। সেই উদ্যোগে যে হিটম্যানদের দলকে দায়িত্ব দেয়া হয়, তরুণ সাদ্দাম ছিলেন তাদের একজন। '৫৯-এর নবেম্বরে সাদ্দাম ও অন্যরা কাশেমকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কাশেমের নিরাপত্তারক্ষীদের ছোঁড়া গুলি হাতে-পায়ে বিদ্ধ হয়ে সাদ্দাম টাইগ্রিস নদী সাঁতরে, মেষপালকের ছদ্মবেশে সিরিয়া পালিয়ে যান। তারপর সেখান থেকে তুরস্ক হয়ে চলে যান মিশর। মিশরে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন সাদ্দাম। এ সময় মিশরের ক্ষমতায় আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা জামাল আবদাল নাসের। নাসের সাদ্দামের কথা জানতেন। তিনি মিশরে সাদ্দামের থাকা-খাওয়া ও হাত খরচের ব্যবস্থা করে দেন। এ সময় সাদ্দাম ছিলেন বাথ পার্টির সামান্য এক সদস্য। যদিও মিশরে বসে তিনি পার্টি সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে থাকেন। এর মধ্যে উত্থান-পতন ঘটে ইরাকের রাজনীতিতে। '৬৩ সালে আরব জাতীয়তাবাদের সমর্থক উপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আবদুল রহমান আরিফ উৎখাত করেন কাশেমকে। ফলে বাথরা ক্ষমতায় আসে। এ সময় ইরাকে পুনরায় ফেরত আসেন সাদ্দাম। এরপর থেকে শুরু হয় তার রাজনৈতিক কেরিয়ার।

ক্ষমতার পথ ধরে

১৮ নবেম্বর ১৯৬৩ থেকে ১৭ জুলাই ১৯৬৮ সাল ইরাকের ইতিহাসে খুবই উত্তাল একটা সময়। অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের জন্য এ সময়টা কুখ্যাত। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশরা ইরাককে স্বাধীনতা দিলেও কোনো কার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সুযোগ দেয়নি। বসিয়ে দিয়ে যায় পুতুল রাজা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আবার ইংরেজরা ফিরে আসে। এবারও যাওয়ার সময় রেখে যায় বিমান ঘাঁটি এবং নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে ইরাকের তেল। এই প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর কতিপয় কর্মকর্তা জেনারেল কাশেমের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে।

ইতিমধ্যে ইরাকের রাজনীতিতে হাওয়া বদল হয়েছে। সোভিয়েত সমর্থনপুষ্ট ইরাকি কমিউনিস্ট পার্টি (আইসিপি) তখন ইরাকে যথেষ্ট জনপ্রিয়। অন্যদিকে আরব জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ আরব বাথ ন্যাশনালিস্ট পার্টিও ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করছে। কাশেমের অভ্যুত্থানে রাজতন্ত্রের পতন হলো ঠিকই কিন্তু বাথ পার্টি ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দল ভয় পেলো সোভিয়েত আধিপত্যের। এই প্রেক্ষিতে '৫৯ সালে বাথ পার্টি কাশেমকে হত্যার চেষ্টা চালায়, যে প্রচেষ্টায় সাদ্দাম জড়িত থাকেন।

'৫৯-এ ব্যর্থ হলেও '৬৩ সালে বাথ পার্টির অনুগত কতিপয় সামরিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদীরা পুনরায় অভ্যুত্থান ঘটায়। এবার তারা সফল হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই সাফল্যের কারণ যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র মনে করছিল, ইরাকে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতাধর হয়ে উঠলে মার্কিন

স্বার্থের হানি হবে। তাই কাশেমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে এবং পরবর্তীতে কমিউনিস্ট দখলে পেছন থেকে মদদ দেয় সিআইএ। কাশেমও এটা জানতেন। যদিও তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কোনো সদস্য ছিলেন না। অভ্যুত্থানের চার দিন আগে কাশেম ফরাসি লা মন্ড পত্রিকাকে বলেন, তিনি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা হুমকি পেয়েছেন, অভ্যুত্থানের পর ফরাসি সাপ্তাহিক লা এক্সপ্রেস মন্তব্য করে, 'ইরাকি অভ্যুত্থানের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল সিআইএ। ব্রিটিশ সরকার এবং নাসের নিজে এই পটপরিবর্তনের ব্যাপারে সজাগ ছিলেন।' লা মন্ড পত্রিকার মতে, মার্কিন মদদপুষ্ট এই ক্যু ছিল মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমাপন্থিদের পুনঃপরিচিতি।

সাদ্দাম এই সময়টা মিশরে। '৬৩ সালে ইরাকে ফেরেন। কিন্তু পার্টির উচ্চ পর্যায়ে তেমন প্রভাব না থাকায় তাকে ক্ষমতার বাইরে থাকতে হয়। বর্তমানে পশ্চিমারা অভিযোগ করেন, সাদ্দাম এই সময় কমিউনিস্ট নিধনে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এপ্রিলে অভ্যুত্থান ঘটে এবং সাদ্দাম মে মাসে দেশে আসেন। মধ্যের সময়টুকুতে প্রায় ৭০০ কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়। পশ্চিমারা যা উল্লেখ করে না তা হলো, কমিউনিস্টদের এই তালিকা সিআইএ সরবরাহ করেছিল বাথ পার্টিকে।

অবশ্য দেশে ফিরে সাদ্দাম ডিটেনশন ক্যাম্পের দায়িত্ব নেন। বিরোধী দখলে এসব ডিটেনশন ক্যাম্পগুলোকে তিনি ভালোভাবে কাজে লাগান। রাজনীতিতে উপরে ওঠার জন্য সাদ্দাম এ সময় মরিয়া। তাই পার্টি তাকে ব্যবহার করছে এই কথাটি তিনি বুঝতে পারেননি। অবশ্য বাথ পার্টির নীতিও ছিল কমিউনিস্ট নিধন। '৫৮-র জুলাইর পরে বাথ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল আফলাক বাগদাদে আসেন। তিনি বলেন, বাথ পার্টি যেসব দেশে ক্ষমতায় থাকবে, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকবে এবং সবরকমভাবে তাদের দমিয়ে রাখতে হবে।

কিন্তু বাথ পার্টির এই অত্যাচারী শাসন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। '৬৩-র নবেম্বরেই সেনাবাহিনী আরেকটি ক্যু করে বাথ পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সেনাবাহিনী-জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বাথ পার্টি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সাদ্দামকে বলা হয় সিরিয়া পালিয়ে যেতে। কিন্তু সাদ্দাম না পালিয়ে গোপনে পার্টি সংগঠনের দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকেন। দলের জন্য এই কষ্টের স্বীকৃতি পান অল্প দিনের মধ্যেই।

১৯৬৮ সালের ১৭ জুলাই সেনাবাহিনীর একাংশের সহায়তায় বাথ পার্টি পুনরায় অভ্যুত্থান ঘটায়। সফল অভ্যুত্থানে বাথ পার্টি ক্ষমতায় আসে এবং এখন পর্যন্ত ইরাকে এই পার্টিই ক্ষমতায়। '৬৮-র অভ্যুত্থানের পর প্রেসিডেন্ট হন আহমেদ আবু বকর। সাদ্দাম ছিলেন বকরের আত্মীয়। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট বকর ইরাকের রাজনীতির বীভৎস পালাবদল দেখে সহকর্মীদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। তাই তিনি আত্মীয় এবং তিকরিতের স্থানীয় লোকজন নিয়ে ক্ষমতা সুসংহত করতে মনোযোগী হন। ফলে ভাগ্য খুলে যায় সাদ্দামের। তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন।

৬০ ও ৭০ দশকের ইরাকীরা সাদ্দামকে এখনো ভক্তি করে

সাদ্দাম এবং পশ্চিমা দেশসমূহ

আজকে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের এক নম্বর শত্রু সাদ্দাম হোসেন। কিন্তু '৬৮ সালে সাদ্দাম যখন ভাইস প্রেসিডেন্ট সে সময় পশ্চিমা দেশগুলো ইরাকের সঙ্গে সুসম্পর্কের জন্য নিজেদের মধ্যে রীতিমতো পাল্লা দিয়েছে। এর অন্যতম একটি কারণ স্নায়ুযুদ্ধ। '৬৩-র অভ্যুত্থানে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় আসে বাথ পার্টি। সিআইএ সেই অভ্যুত্থানের মদদদাতা, এ কথা প্রমাণিত সত্য। সে সময় অভ্যুত্থানে অংশ নেয়া সামরিক অফিসারদের অনেকের সঙ্গেই সিআইএ যোগাযোগ রাখছিল। এমনকি অভ্যুত্থান চলাকালে সিআইএ কুয়েতে ইলেকট্রনিক কমান্ড সেন্টার স্থাপন করে কাশেমের বিরুদ্ধে লড়াইরত সৈনিকদের নির্দেশনা দিয়েছিল। অভ্যুত্থান সফল হবার পর বিরোধী দলের তালিকাও সিআইএ বাথ পার্টির হাতে তুলে দিয়েছিল। আজকে যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দামের মানবাধিকার রেকর্ড নিয়ে কথা বলে। কিন্তু এর পেছনে মদদদাতা যে নিজেরা সে কথা চেপে যায়। অন্যদিকে অভ্যুত্থানে সাহায্য করার বিনিময়ে বাথ পার্টি কাশেমের আমলে সংগৃহীত সোভিয়েত মিগ জঙ্গি বিমানের নকশা তুলে দেয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে।

'৬৮-র অভ্যুত্থানের ব্যাপারটি একই রকম ছিল। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, বাথ পার্টি ও যুক্তরাষ্ট্রের এই সম্পর্কের ভিত্তি কোনো আদর্শ ছিলো না। বরং বিশ্লেষকরা একে 'সুযোগসন্ধানী মৈত্রী' বলে অভিহিত করেছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হবার পর সাদ্দাম এই 'সুযোগসন্ধানী মৈত্রী' অব্যাহত রাখেন। '৬৮ সালে বাথ অভ্যুত্থানের সময় ইরাকের ক্ষমতায় ছিল ঐক্যবদ্ধ আরবের স্বপ্নদ্রষ্টা নাসেরের সমর্থক। কিন্তু '৬৭-র আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে মিশরের পরাজয়ের ফলে নাসেরপন্থিরা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বাথ পার্টির ক্ষমতা দখলকে জনগণ খুব একটা বিরোধিতা করেনি। কিন্তু এই অভ্যুত্থানও মার্কিন-সোভিয়েত রশি টানাটানির বাইরে নয়।

এ সময় ইরাকে দুটো ব্যাপার ঘটেছিল। প্রথমত, ইরাক নিজের তেলক্ষেত্রগুলোর উন্নয়ন ঘটাচ্ছিলো এবং এ কাজে সহায়তার জন্য রাশিয়া ও ফ্রান্সকে তেলের মূল্য ছাড় দিচ্ছিল। অন্যদিকে বিশ্ববাজারে সালফারের সরবরাহ কমে যায়। ফলে ইরাক উত্তরাঞ্চলীয় সালফারের খনি থেকে সালফার উত্তোলন এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র এ দুটোর কোনোটিই চায়নি। যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল ইরাকে কেবল মার্কিন কোম্পানিই কাজ করবে যেন তারা কম দামে ইরাকি তেল কিনতে পারে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সালফারের প্রয়োজনও ছিল।

ক্ষমতাসীন হয়েই সাদ্দাম যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা ধরতে পারেন। সাদ্দাম আগে থেকেই জানতেন, যুক্তরাষ্ট্র বাথ পার্টিকে ক্ষমতায় দেখতে চায়। '৫৯-৬৩ সাল পর্যন্ত সাদ্দামের কায়রো অবস্থানকালে মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যুক্তরাষ্ট্র কাশেম বিরোধী ছিল। অতএব, সাদ্দাম মারফত বাথ পার্টিকে নির্দেশনা জানানো অব্যাহত ছিল। এ সময় মিশরীয় গোয়েন্দা বিভাগ সাদ্দামকে সতর্ক করলেও সাদ্দাম মার্কিন কানেকশন বজায় রাখেন। ফলে মিশর থাকাকালীন সাদ্দামকে অন্তরীণও করা হয়। ক্ষমতাসীন হবার পর যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টায় সফল হন সাদ্দাম। ইরাকের তেল ও সালফারের দখল নিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এ সময় শীর্ষ ব্যক্তিত্ব সাবেক অর্থমন্ত্রী রবার্ট এন্ডারসনকে পাঠান দর কষাকষি করার জন্য। দু'পক্ষ একমত হয়। ইরাকের তেল ও সালফার পায় যুক্তরাষ্ট্র, বাথ পার্টি পায় সমর্থন। ক্ষমতায় আসার পর এ কারণেই বাথ পার্টির সমস্ত বিরোধী নিপীড়ন

মেনে নেয় যুক্তরাষ্ট্র।

এই মধুচন্দ্রিমা অবশ্য বেশিদিন চলেনি। স্বার্থে আঘাত লাগতেই মৈত্রী থেকে সরে দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। কারণ বাথ পার্টি তথা সাদ্দাম এমন কিছু জিনিস যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দাবি করছিলো যা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি অনুমোদন করে না। ব্যাপারটি সাদ্দামকে ক্ষিপ্ত করে। ফলে ইরাকি প্রশাসন থেকে সব রকম মার্কিন উপাদান ঝেড়ে ফেলতে সচেষ্ট হন সাদ্দাম। এ সময় সাদ্দাম অর্থের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হাত পাতে। এছাড়াও অস্ত্রের প্রয়োজনও ছিলো। অথচ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র কোনো আরব দেশকে আধুনিক অস্ত্র যোগাতে অস্বীকার করে। সাদ্দামের কাছে অন্য বিকল্প ছিলো। এবার সাদ্দাম সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বারস্থ হয়।

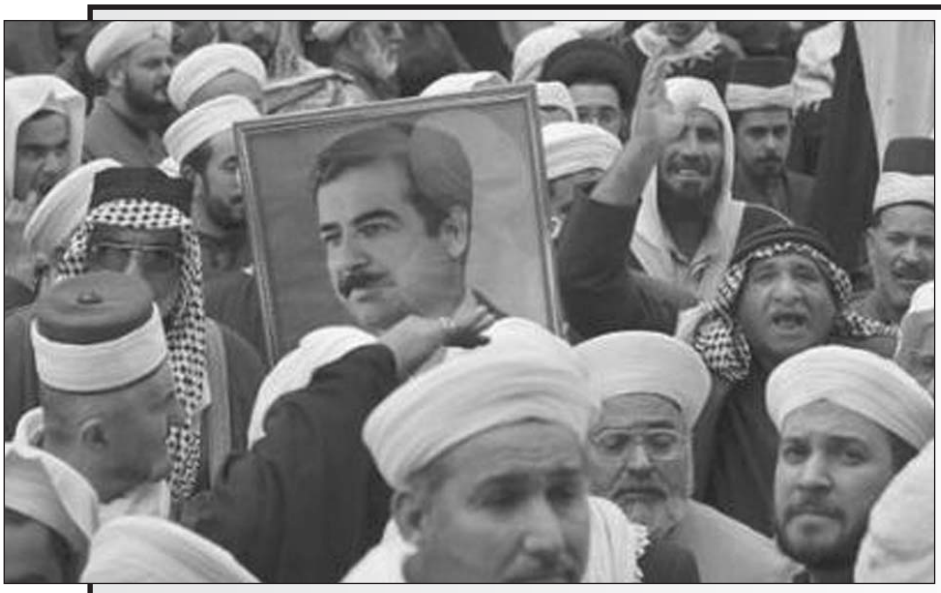

সাদ্দামের গোপন অস্ত্র

ইঙ্গ-মার্কিন জোটবাহিনীর ধারণা ছিলো, ইরাকে প্রবেশ করা মাত্র ইরাকিরা বসরার গোলাপ দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে। পশ্চিমা মিডিয়া ব্যাপক প্রচারণা চালায়, ইরাকে সাদ্দামের জনসমর্থন বলে কিছু নেই। সাধারণ মানুষ সাদ্দামের শাসন থেকে মুক্তি পেতে উদ্‌গ্রীব। তাই জোট বাহিনী ইরাক আক্রমণ শুরু করলে দিকে দিকে সাদ্দাম বিরোধী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বে।

বাস্তবে তা হয়নি। শুধু তাই নয়, ইরাকের নিয়মিত সেনাবাহিনী ও বাথ মিলিশিয়াদের পাশাপাশি অস্ত্র হাতে সাধারণ নাগরিকরাও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। যে যেভাবে পারছে দেশমাতৃকার জন্য জীবনবাজি দিয়ে লড়াই করছে। 'বিনাযুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদেনী' এই

এটা ৭০ দশকের কথা। সাদ্দাম এ সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট বকর ছিলেন ভগ্ন স্বাস্থ্য ও দুর্বলচিত্তের মানুষ। অন্যদিকে সাদ্দামের জীবনী লেখক সাঈদ আবুরিশের মতে, সাদ্দাম অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। এ সময় তিনি দৈনিক ১৮ ঘন্টা কাজে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে প্রথমদিকে কেবল কৃষি বিভাগের দায়িত্বে থাকলেও ক্রমান্বয়ে সাদ্দাম

গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পান। এ সময় তার দায়িত্বে আসে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সংস্থার দায়িত্ব। তিনি সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজান এবং এর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে নিজের আত্মীয়স্বজনকে নিয়োগ দেন। ফলে যাবতীয় ক্ষমতা মূলত সাদ্দামের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়।

সত্তরের শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে সাদ্দাম সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ক্ষমতায় আসার পর সাদ্দাম প্রথম বিদেশ সফরে যান সোভিয়েট ইউনিয়নে। যুক্তরাষ্ট্র তাকে যা দেয়নি, রাশিয়ার কাছে তাই পান সাদ্দাম। ১৯৭২ সালে ইরাক-রাশিয়া 'মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি' সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে দুই দিক দিয়ে লাভবান হন সাদ্দাম। প্রথমত, অস্ত্র চাহিদা পূরণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইরাক বৃহৎ শক্তির সমর্থন লাভ করে। দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বাথ পার্টির চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা লাভ করেন সাদ্দাম। কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েট পরামর্শে বাথ পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়।

১৯৭৯ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সাদ্দাম প্রেসিডেন্ট হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে অম্ল-মধুর সম্পর্ক বজায় রাখেন সাদ্দাম।

সাদ্দাম-আমেরিকা সম্পর্ক

১৯৭৯ সালে সাদ্দাম ইরাকের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে আগ্রহী হয় তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে। আজকে যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দাম উৎখাতে যুদ্ধ শুরু করেছে। অথচ '৮০-র দশকে যুক্তরাষ্ট্র মনেপ্রাণে চেয়েছে সাদ্দাম ক্ষমতায় থাক। এর কারণ দুটো- এক. সাদ্দাম ক্ষমতায় থাকলে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা পাবে না। দুই. ইরানে খোমেনীর ইসলামী বিপ্লব যেন মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে না পড়ে এজন্য সাদ্দামকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার।

ইরাকী প্রতিরক্ষা মন্ত্রির পাশে বসে আছেন বিজ্ঞানী ড. আমাশ

মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে যুদ্ধের প্রথমদিকে ইরাক ছেড়ে যাওয়া যুবকরা ফিরে আসছেন নিজেদের মাটিতে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, যুদ্ধের শুরুতে ইঙ্গ-মার্কিন জোট মনে করেছিলো, তারা বাধার সম্মুখীন হবে মূলত রিপাবলিকান গার্ড ও স্পেশাল রিপাবলিকান গার্ডের তরফ থেকে। সাধারণ ইরাকিরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন এমনটা ধারণাতেও ছিলো না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সাধারণ ইরাকিরাই সাদ্দামের গোপন অস্ত্র। যা এখন কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আল-ফাও, উম্মকসর, বসরা, নাসিরিয়া, কারবালা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, সাধারণ জনগণ লড়াই করছে। কারবালাতে এক বৃদ্ধ কৃষক তার পুরনো রাইফেল দিয়ে মার্কিন অ্যাপাচি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করেছেন এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপারও ঘটছে। সবচে' বড় কথা, নাসিরিয়াতে আত্মঘাতী বোমা হামলা করে ৪ জন মার্কিন সেনা খতম করেছে সাধারণ ইরাকিরাই।

পশ্চিমাদের ধারণা ছিলো, সাদ্দাম দেশে মোটেই জনপ্রিয় নয়। দমন-পীড়ন ও অত্যাচার করে তিনি সাধারণ জনতাকে বশে রেখেছেন। কিন্তু যারা ইরাকের ব্যাপারে নিরপেক্ষ দৃষ্টি পোষণ করেন তারা মনে করেন সাদ্দাম ইরাকে যথেষ্ট জনপ্রিয়। সাদ্দামের ডাকে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে এমন লোকের অভাব নেই ইরাকে। '৯১-র কুয়েত আক্রমণের সময় কুয়েতে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত মি. চিমার মতে, 'সাদ্দাম এমনিতেই জনপ্রিয় ছিলেন এবং কুয়েত আক্রমণের পর তার জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়।'

ইরাকি সমাজ ব্যবস্থায় গোত্র বা অঞ্চলপ্রীতি বিশেষ লক্ষণীয়। '৯১-র উপসাগরীয় যুদ্ধের পর সাদ্দাম হোসেন এসব উপজাতিদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলায় মনোযোগী হন। বিশেষত '৯২ সালে বিভিন্ন উপজাতি নেতাদের তিনি তার প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। ইরাকে যখন রাজতন্ত্র ছিলো তখন এসব উপজাতি নেতারা অঞ্চলভেদে দারুণ ক্ষমতাশালী ছিলো। কিন্তু বাথ শাসনামলে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। সাদ্দাম সেই সময়কার ভূমি সংস্কারের ফলে উপজাতীয়দের ক্ষতিগ্রস্ত হবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এবং উপজাতি নেতারা হয়ে পড়েন সাদ্দামের দারুণ অনুরক্ত। সাদ্দাম আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, দেশে জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে উপজাতীয়দের আনুগত্য বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষত '৯১ সালে দক্ষিণাঞ্চলের শিয়া বিদ্রোহ দমনে এদের সহযোগিতা খুব কাজে এসেছিলো।

এবারও ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের মুখে উপজাতিদের প্রতিরোধ দারুণ কাজে আসছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, পশ্চিমা জোট সাদ্দামের এই গোপন অস্ত্রের ব্যাপারে এখন ভীত। কারবালায় হেলিকপ্টার ধ্বংস করা বৃদ্ধ আলী ওবায়েদের মতো লাখ লাখ গোপন অস্ত্র এখন তৈরি।

উদে'কে সামরিক ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন সাদ্দাম

'৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব এবং ইরাকে সাদ্দামের প্রেসিডেন্ট হওয়া প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। শাহের আমলে আয়াতুল্লাহ খোমেনী ইরাকে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এসময় ইরাকি শিয়া সম্প্রদায়ে খোমেনীর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ভাইস প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম ব্যাপারটি ভালো চোখে দেখেননি। ১৯৭৯ সালে সাদ্দাম খোমেনীকে বহিষ্কার করেন। এসময় খোমেনী হুমকি দেন, তিনি সাদ্দামের কাটা মাথা সবাইকে দেখাবেন। সাদ্দাম-খোমেনীর এই তিক্ত সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৭৯-র জুলাই মাসে ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সাদ্দাম আম্মান সফর করেন। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর আগে এই সফর ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র জর্ডানের রাজা হুসেনের মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসনে তিনি ইরান আক্রমণের বার্তা পাঠান। এসময় সিআইএর তিনজন এজেন্ট সাদ্দামের সঙ্গে বৈঠক করে। এরপর সাদ্দাম সৌদি আরব যান এবং বাদশাহ ফাহদের মাধ্যমে একই বার্তা পাঠান। এরপর যান কুয়েতে। সেখানেও একই কাজ করেন। এর মাধ্যমে সাদ্দাম মার্কিন মিত্রদের সহায়তায় যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন এবং অস্ত্র প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন।

ইরান আক্রমণ ছিলো সাদ্দামের জন্য জুয়া খেলা। সাদ্দাম ভয় পাচ্ছিলেন ইরানের শিয়া বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে ইরাকি শিয়ারা বিদ্রোহ করতে পারে। অবশ্য সাদ্দামের আশঙ্কা অমূলক ছিলো না। ইতিমধ্যে নাজাফে শিয়া মিলিশিয়ারা বিদ্রোহ করেছে। অন্যদিকে, খোমেনীও ঘোষণা দিয়েছেন সাদ্দামকে উৎখাত করার। এমতাবস্থায় মার্কিন সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় ছিলেন সাদ্দাম। ১৬ জুলাই ১৯৭৯ প্রেসিডেন্ট বকর সরে দাঁড়ান এবং সাদ্দাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৭ জুলাই তার ফিল্ড মার্শাল পদে পদোন্নতি ঘটে। এর অল্প দিনের মধ্যেই শুরু হয় যুদ্ধ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরাক-ইরান দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি ছিলো নীতিগত বিরোধের যুদ্ধ।

পশ্চিম বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অবশ্য ব্যাপারটা তা ছিলো না। যুক্তরাষ্ট্র খোমেনীকে যেমন দেখতে পারতো না, তেমনি সাদ্দামকেও। দু'জনের বিরোধ থেকে ফায়দা লোটার সুবিধা তাই যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে চায়নি। তাই প্রকাশ্যে সাদ্দামের কাছে যেমন অস্ত্র বিক্রি করেছে, গোপনেও ইরানকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র চায়নি কোনো পক্ষই জিতুক। অন্যদিকে এসময়টা মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের অবস্থান জোরালো করতে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। ইরাক ইরান আক্রমণ করলে সোভিয়েট ইউনিয়ন ইরাককে অস্ত্র সরবরাহে বেঁকে বসে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তিন বছর পর সোভিয়েট ইউনিয়ন পুনরায় ইরাকে অস্ত্র বিক্রি শুরু করে।

এখন প্রশ্ন হলো, সাদ্দাম কেন মার্কিন পলিসি বুঝতে ব্যর্থ হলো? পরবর্তীতে এক সাক্ষাৎকারে সাদ্দাম স্বীকার করেছিলেন, তিনি পশ্চিমা ফাঁদে পড়েছিলেন। যুদ্ধ শুরুর পর তার ফিরে আসার উপায় ছিলো না। যুদ্ধের পর সাদ্দাম যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে পশ্চিমা দেশগুলোর সহায়তা চাইলেন, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ সময় ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিশেষত '৮৮ সালে কুর্দিদের ওপর রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। অথচ যুদ্ধ চলাকালে সাদ্দাম যখন হালাবজায় কুর্দিদের ওপর রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্র সেটা জেনেও চুপ ছিলো। উপরন্তু, ইউএস ওয়ার কলেজ এ সময় ৪০ পৃষ্ঠার যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে বলা হয়েছিলো, হালাবজায় সাদ্দাম নয়, বরং ইরাকি বাহিনীই রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলো।

পশ্চিমের বিশ্বাসঘাতকতা সাদ্দামকে ক্ষুব্ধ করে। সাদ্দাম এবার মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থে আঘাতের প্রস্তুতি নেন। মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী সাদ্দাম এ সময় ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ ৮ বছর যুদ্ধের পর ইরাকের অর্থনীতির কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। তাই সৌদি আরব ও কুয়েতের কাছে সাহায্য চান সাদ্দাম। যেন তেলের উৎপাদন কমিয়ে দাম বাড়ানো হয়। কিন্তু কুয়েত ও আরব আমিরাত ওপেক কোটার দ্বিগুণ পরিমাণ তেল বাজারে বিক্রি করতে থাকে। ফলে তেলের দাম নেমে যায় ব্যারেল প্রতি ১৪ ডলারেরও নিচে। প্রতি ১ ডলার দাম হ্রাসে ইরাকের ক্ষতি হচ্ছিলো বিলিয়ন ডলারের উপরে। এ সময় কুয়েতের অর্থনীতি এতো খারাপ ছিলো না যে তাদের অতিরিক্ত তেল উৎপাদন করতে হবে। সাদ্দাম

এর পেছনে মার্কিন কারসাজি বুঝতে পারেন। সাদ্দামের ভয় হয় ১৯৬৩ সালে জেনারেল কাশেমকে সরানোর জন্য সিআইএ কুয়েতকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিলো। এবারও তার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। ইরান আক্রমণের মতো আবারো ভুল করেন সাদ্দাম কুয়েত আক্রমণ করে। সাদ্দামের ধারণা ছিলো, এবারো তেল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষি করতে পারবেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তাকে সেই সুযোগ দেয়নি। '৯১-এ শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে উপসাগরীয় যুদ্ধ। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ততোদিনে ব্যক্তি সাদ্দামের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

সাদ্দাম এবং পশ্চিমা অস্ত্র

সাদ্দাম হোসেন পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে বরাবরই সোনার ডিমপাড়া রাজহাঁস হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। বন্ধু সেজে এসব দেশ প্রতি বছর শত শত কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে সাদ্দামের কাছে। আর অমূল্য সম্পদ তেল বিক্রি করে এসব অস্ত্রের মূল্য চুকিয়েছেন সাদ্দাম। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি- প্রায় সব অস্ত্র বিক্রেতা দেশই এ কারণে সাদ্দামের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে আগ্রহী ছিলো।

১৯৭২ সালে ইরাক-সোভিয়েট ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি হবার পর থেকে সোভিয়েটই ছিলো দেশটির অস্ত্রের প্রধান যোগানদার। এ সময় ইরাকের ৯৫ শতাংশ অস্ত্রই আসত রাশিয়া থেকে। কিন্তু '৭৫-এর পর ফ্রান্সের সঙ্গে ইরাকের সুসম্পর্ক তৈরি হলে সোভিয়েট অস্ত্রের ক্রয় '৭৯তে ৬৩ শতাংশে নেমে আসে। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ফরাসি অস্ত্রের চাহিদা। ১৯৭৮ সালে ১৮টি মিরেজ এফ-১ যুদ্ধবিমান, ৩০টি হেলিকপ্টারসহ ২০০ কোটি ডলারের অস্ত্র ক্রয় করে ইরাক ফ্রান্স থেকে। এ সময় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আজকের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক। তিনি বাগদাদের কাছে পারমাণবিক প্লান্ট বসাতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭৫ সালেই ফ্রান্স অবশ্য সাদ্দামকে ওসিরিস গবেষণা রিঅ্যাক্টর এবং পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে সক্ষম আইসিস স্কেল মডেলের প্লান্ট বসানোর এবং বাৎসরিক ৭২ কেজি বোমা বানানোর ক্ষমতাসম্পন্ন ইউরেনিয়াম সরবরাহের চুক্তি করে। এ সময় সাদ্দাম বলেছিলেন, ফ্রান্সের সঙ্গে এই চুক্তি প্রথম আরব অ্যাটম বোমা তৈরির পথে দৃঢ় পদক্ষেপ। এ ছাড়া সাদ্দাম পারমাণবিক প্লান্ট বসানোর জন্য ব্রাজিলের সঙ্গেও কথা বলেন। ১৯৭৮ সালে ইটালির 'এসনিয়া টেক ইন্ট' কর্পোরেশন সাদ্দামের কাছে পারমাণবিক গবেষণাগার বিক্রিতে রাজি হয়।

১৯৮০ সালে শুরু হয় ইরাক-ইরান যুদ্ধ। এ সময় পশ্চিমা দেশগুলো ইরাককে অস্ত্র সরবরাহে নিজেদের মধ্যে রীতিমতো পাল্লা দেয়া শুরু করে। '৮২ সালে ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ ঘোষণা করেন, আমরা চাই না ইরাক এই যুদ্ধে পরাজিত হোক। কারণ এদিকে

বাথ পার্টি

বাথ পার্টি ১৯৬৮ সাল থেকে ইরাকে ক্ষমতাসীন। এর আগে ১৯৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট কাশিমকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরিয়ে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এসেছিলো। কিন্তু কয়েক মাস পরেই সেনাবাহিনীর পাল্টা ক্যু'র ফলে ক্ষমতা ছাড়তে হয় তাদের।

বাথ পার্টির পুরো নাম 'আরব বাথ সোশ্যালিস্ট পার্টি'। আরবি 'বাথ' মানে 'রেনেসাঁ' বা 'পুনর্জাগরণ'। আরব জাতীয়তাবাদের দর্শনধারী এই দলটির প্রতিষ্ঠা ১৯৪৩ সালে সিরিয়ার দামেস্কে, মাইকেল আফলাক এবং সালাহ আদ-দীন আল বিতরের হাতে। আদর্শগতভাবে বাথ পার্টি যদিও সমাজতান্ত্রিক কিন্তু দেশে এরা কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচন্ডভাবে। ১৯৬৩ সালে ক্ষমতায় আসার পর হাজার হাজার কমিউনিস্ট নেতাকর্মীকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে এই পার্টির ভেতরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন উত্তাল সময়ে আরব ভূখন্ডে রাজনৈতিক ভিত্তি বলে কিছু ছিলো না। ধর্মের প্রভাব ছিলো জোরালো। এ সময় চল্লিশ দশকে পশ্চিমে শিক্ষিত মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিরা এই প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু মার্কস যেমন বলেছেন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন রাজনীতির কথা, বাথ বুদ্ধিজীবীরা তা বলেননি। এ কারণেই বাথ সোশ্যালিস্টদের চরিত্র অন্যদের থেকে ভিন্ন। কেননা ইসলামের ব্যাপক প্রভাব যেই ভূখন্ডে, সেখানে ধর্মকে একপাশে সরিয়ে দেয়াটা কিছুতেই সম্ভব নয়। উপরন্তু, ইসলামই হলো আরব জাতীয়তাবাদের মূল শক্তি। বাথ দর্শন ইসলামী ঐতিহ্য ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করে। মাইকেল আলফাকের ভাষায়, 'ইসলাম ধর্মের জন্যই আজ আরব জাতি এক বৃহৎ অনন্ত সম্ভাবনাময় সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে স্বীকৃত।' মাইকেল আলফাক নিজে খ্রিস্টান হলেও অনুধাবন করেছিলেন আরব ভূখন্ডের ইসলামী ঐতিহ্যের গুরুত্ব। তিনি আরো বলেন, 'অতএব আমাদের শক্তি কেবল আরবদের বিপুল সংখ্যাধিক্যেই নয়, পাশাপাশি আমাদের শক্তি আরব ইতিহাসেও নিহিত।'

ঐতিহ্যকে তুলে ধরে সমগ্র আরব জনগণকে এক কাতারে এনে বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করাই ছিলো বাথ পার্টির লক্ষ্য। 'আরব দুনিয়ার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যই বাথ পার্টির সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টার অনুপ্রেরণাস্থল। আরব বিপ্লবের চরিত্র এ যুগের সমস্ত বিপ্লব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এটি অনন্য। আধুনিক কোনো জাতিই এতোটা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে যায়নি। আরব জাতিকে পঙ্গু করে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা সব কিছু করেছে– সারা পৃথিবীতে আমাদের বিরুদ্ধে শুধু প্রচারই করেনি, আমাদের জনগণের ওপর সীমাহীন লুণ্ঠন আর অত্যাচার চালিয়েই সন্তুষ্ট হয়নি, যাতে আমাদের মধ্যে একতা না আসে এর জন্য সবরকমের চেষ্টা করেছে। আরব আধ্যাত্মিক সম্পদ একটা অনড় স্থায়ী বস্তু নয়, বর্তমান যুগ সমস্যার আলোয় আরব সভ্যতার ঐশ্বর্যের মূল্যায়ন করতে হবে।'

একটি প্রবন্ধে মাইকেল আফলাক আরো বলেছেন, 'প্রয়োজন নিরন্তর সংগ্রামের, স্বার্থত্যাগের। একটি পুরাতন জীর্ণ অবক্ষয়ী সমাজ ভেঙে ফেলে একটা নতুন সমাজ নতুন মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই আদর্শ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির আত্মীয়।'

'৬৮ সালে সিরিয়াতে ক্ষমতায় আসে বাথ পার্টির মার্কসবাদী অংশ। ইরাকের বাথ পার্টি ছিলো তাদের দৃষ্টিতে সুবিধাবাদী, শোধনপন্থী। অন্যদিকে আফলাক ১৯৫৮ সালে পালিয়ে চলে আসেন ইরাকে। '৮০ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় বাগদাদে মারা যান। আফলাক চেয়েছিলেন ইরাক নাসেরের ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকে যোগ দিন। কিন্তু কমিউনিস্টরা ছিলো এর বিরোধী। এ জন্য আফলাক মন্তব্য করেছিলেন, 'যেসব দেশে বাথ পার্টি ক্ষমতায় সেখানে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় তাদের দমিয়ে রাখা হবে।' এই দর্শন সাদ্দামের মতো আরো অনেককে '৫৯ সালে কমিউনিস্টপন্থি প্রেসিডেন্ট কাশিমকে হত্যার চেষ্টায় অনুপ্রাণিত করেছিলো।

ইরাকে ফ্রেঞ্চ অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছে। ১৯৮১ সালে এই পরিমাণ ছিলো ২১৫ কোটি ডলার, ১৯৮২তে ১৯৩ কোটি ডলার এবং '৮৩তে ২০০ কোটি ডলারেরও বেশি। এদিকে '৭৫ সালের চুক্তি মোতাবেক ফ্রান্স '৭৯ সালে ওসিরাক রিঅ্যাক্টর তৈরির কাজ শেষ করে। রিঅ্যাক্টরটি ইরাকে স্থানান্তরের অল্প ক'দিন আগে এক অজ্ঞাত কারণে বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এক মাস পর এক জার্মান পত্রিকা আবিষ্কার করে, শ্রমিকের ছদ্মবেশে সাতজন ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের গুপ্তচর এই বিস্ফোরণ ঘটায়। জানা যায়, এর পেছনে আমেরিকার হাত ছিলো।

সাদ্দামের পরামাণু অস্ত্র তৈরির স্বপ্ন অবশ্য চিরকালই স্বপ্ন থেকে গেছে। বিশেষত ইসরাইলের কারণে। '৭৯ সালে ধ্বংস হবার পর ফ্রান্স পুনরায় রিঅ্যাক্টরটি নির্মাণ করে এবং ১৯৮১ সালের জুনে তা ইরাকে বসিয়ে দিয়ে আসে। ইতিমধ্যে নাইজার, ব্রাজিল, পর্তুগাল ইরাককে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু '৮১-র জুলাইতে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা আরেকটি দুঃসাহসী অপারেশন চালায় যার নাম 'অপারেশন ব্যাবিলন'। প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিনের নির্দেশে ইসরাইলিরা সেই একই ফরাসি কোম্পানিকে দিয়ে ইরাকের ওসিরাক প্লান্টের মতো একটি প্লান্ট তৈরি করে অপারেশনের মহড়া দেয়। এ সময় সিআইএ স্যাটেলাইট থেকে নেয়া ইরাকি প্লান্টের ছবি সরবরাহ করে ইসরাইলকে। ৭ জুলাই ইসরাইলি এফ-১৬ বিমানগুলো উড়ে আসে ইরাকের ওপর। জর্ডানের আকাশসীমায় থাকতে মোসাদ এজেন্টরা সৌদি আরবের অ্যাকসেন্টে আরবিতে জানায় এটি সৌদি বিমান। অন্যদিকে জর্ডানকে জানায় তারা সৌদি বিমানবাহিনীর ক্রু। এরপর বোমা মেরে ধ্বংস করে দিয়ে আসে সাদ্দামের পারমাণবিক চুল্লী। '৮১ সালে সৌদি আরব প্রতিশ্রুতি দেয়, তারা ইরাককে টাকা দেবে আরেকটি চুল্লী প্রতিষ্ঠার জন্য। যদিও সৌদি আরব সেই প্রতিশ্রুতি রাখেনি। ফ্রান্স এগিয়ে আসেনি। যদিও তারা '৮০-'৮৮'র ইরাক-ইরান যুদ্ধে ৫৬০ কোটি ডলারের বেশি অস্ত্র বিক্রি করেছিলো ইরাকের কাছে।

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রও এ সময় বসে ছিলো না। জেনারেল ইলেক্ট্রনিক্স এ সময় ইরাকি নৌবাহিনীর জন্য ইটালিতে তৈরিকৃত জঙ্গিবিমানের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেছিলো। এছাড়াও লকহিড কোম্পানি হেলিকপ্টার সরবরাহ করেছিলো ইরাকি নৌবাহিনীতে। ১৯৮২ তে দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ইরাককে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের তালিকা থেকে বাদ দিতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। অবশেষে '৮৪তে দু'দেশের মধ্যে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিস্থাপিত হয়। এর আগে '৮৩তে মার্কিন কর্মকর্তা উইলিয়াম ইগলটন বাগদাদে আসেন। তিনি ইরানের কাছে বিক্রির পরিবর্তে মিশরের মাধ্যমে ইরাকে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি করেন। অবশ্য '৮২তেই যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের কাছে 'বেসামরিক' বিমান বিক্রি করে। '৮৩-র জুলাইতে রিগ্যান প্রশাসন ইরাকের কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য ৬০টি হেলিকপ্টার সরবরাহ করে যা রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রবহনেও সক্ষম ছিলো। অন্যদিকে, ইরাকে খাদ্যাভাব যেন না হয় সেজন্য মার্কিন প্রশাসন ৪৬ কোটি ডলার ঋণ দেয় ইরাককে। এই অর্থ দিয়ে ইরাক ১ লাখ ৪৭ হাজার টন আমেরিকান চাল কেনে।

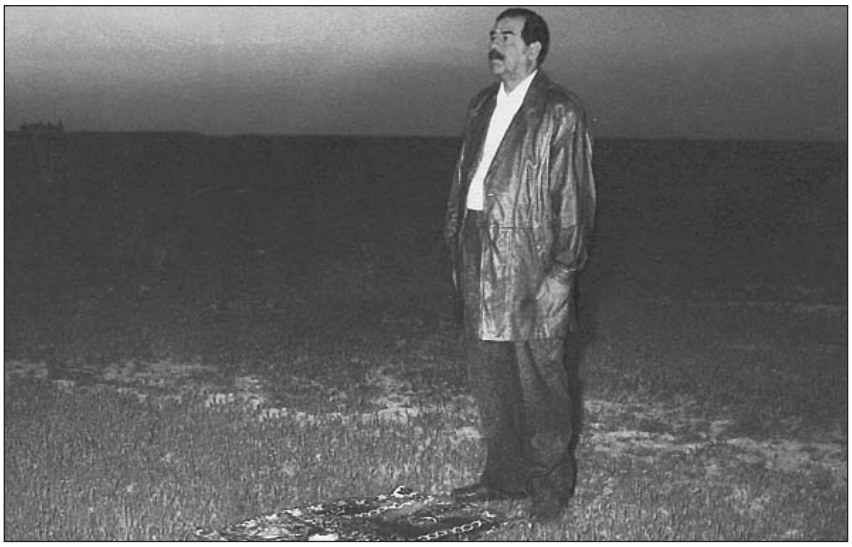

ব্যক্তিগত জীবনে সাদ্দাম ধার্মিক

এদিকে তখন ইরাক-ইরান যুদ্ধ চলছে জোরেশোরে। ওয়াশিংটন ঘোষণা দেয় 'ইরাকের পরাজয় মার্কিন স্বার্থের জন্য বড় রকমের আঘাত' হবে। ১৯৮৪-র মার্চে জর্জ শুলজ বলেন, 'আমরা ইরানের বিজয় দেখতে চাই না। তাই সচেতনভাবেই আমরা ইরাকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাচ্ছি... আমরা ইরাকের সঙ্গে বেশ কিছু বিষয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছি।' '৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র' ঘোষণা করে এবং স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য ইরাককে জানাতে শুরু করে। ১৯৮৮ সালে মার্কিন দূতাবাস ইরাকে একটি বাণিজ্য মেলার আয়োজন করে যেখানে হাইটেক সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

আজকে ইরাক আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী ব্রিটেনও এ সময় বসে থাকেনি। ১৯৮৯ সালে ব্রিটেনের বাণিজ্যমন্ত্রী ডগলাস হগ সাদ্দামকে মিসাইল কেনার জন ২০ লাখ পাউন্ড ঋণ দেন। এ সময় ব্রিটিশ কোম্পানি এফএমটি ইরাকে ভ্রাম্যমাণ রকেট লঞ্চার সরবরাহ করে। '৮৮ সালে ব্রিটেন সাদ্দামকে সিম্বেলিন মর্টার লোকেটিং রাডার, হুভারক্রাফট ও ট্যাংকের যন্ত্রাংশ, গোপন কোড উদ্ধারের যন্ত্রপাতি, লেজার রেঞ্জফাইন্ডারসহ বহুবিধ অস্ত্র সরবরাহ করে। এ ছাড়া ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে ব্রিটেনের কমন্স সভার বাণিজ্য ও শিল্প কমিটির তদন্তে উদঘাটিত হয় চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা যায়, ১৯৮৭-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৯০-এর ৫ আগস্টের মধ্যে ইরাকি সেনাবাহিনীকে ব্রিটিশ পারমাণবিক ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছে হোয়াইট হল। এ ছাড়া '৯০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২ লাখ পাউন্ডের রাসায়নিক অস্ত্র যেমন- মাস্টার্ড গ্যাস সরবরাহ করেছে ব্রিটেন। এ ছাড়া '৮৯ সালে রাসায়নিক অস্ত্রের ওষুধ সরবরাহ করে ব্রিটেন। অন্যদিকে '৯১ সালে শুল্ক কর্মকর্তারা দেখেন সাদ্দামের পারমাণবিক গবেষণাগারে ব্রিটিশ কোম্পানি কাজ করেছে। অন্যদিকে, কুয়েত আক্রমণের আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দাম হোসেনকে অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্তে অটল ছিলো। কুয়েত আক্রমণের দিনকতক আগেও মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট কংগ্রেসকে অনুরোধ করে ইরাকে যেন অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দেয়া হয়। এ সময় সিনেটর রবার্ট ডোল, আলান সিম্পসন প্রমুখ ইরাকের সঙ্গে বাণিজ্য প্রসারের আহ্বান জানান।

উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ইরাকের প্রতি মার্কিন পলিসি তদন্তকারী কংগ্রেস তদন্ত দলের প্রধান সিনেটর হেনরি গনজালেস বলেন, কুয়েত আগ্রাসনের আগ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট বুশ সাদ্দাম হোসেনকে ঋণ, প্রযুক্তি এবং গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে সরকারি নিয়ন্ত্রণকে পদদলিত করেছেন।

অন্যদিকে, ডেমোক্রেট সদস্য চার্লস শুমার স্পেশাল হাউস ব্যাংকিং কমিটির শুনানিতে বলেন, 'সাদ্দাম হচ্ছে প্রেসিডেন্ট বুশের ফ্রাঙ্কেনস্টাইন– যাকে প্রেসিডেন্ট মার্কিন করদাতাদের শত শত কোটি ডলার খাইয়েছেন এবং সাদ্দাম পরিণত হয়েছে এক দৈত্যে।' ১৯৯২ সালে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বুশকে 'সাদ্দামগেট' কেলেঙ্কারির কারণে পরাজিত হতে হয়েছিলো।

ইতিহাসের নাম সাদ্দাম

'সাদ্দাম হোসেন (১৯৩৭-২০০৩) ২৪ বছর ইরাকের শাসন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা স্বৈরচারী প্রেসিডেন্ট। বিশ্বশান্তির পক্ষে ক্রমশ হুমকি হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনসহ কয়েকটি পশ্চিমা শক্তির জোট তাকে উৎখাতের লক্ষ্যে ইরাক আক্রমণ করে। যুদ্ধ শুরুর অল্প কিছু দিনের মধ্যে বাগদাদ দখলের লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরী থেকে ছোঁড়া ক্রুজ মিসাইলের আঘাতে মৃত্যু ঘটে এই যুদ্ধবাজ একনায়কের।'

অনাগত ভবিষ্যতে ইতিহাসের ছাত্ররা কি এভাবেই জানবে সাদ্দাম হোসেনকে? নাকি জানবে সাদ্দাম হোসেন ছিলেন সেই আরব নেতা, যিনি সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির মুখে লেজ তুলে পালাননি। যিনি মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বিনষ্টকারী ইসরায়েলকে আঘাত করার সাহস দেখিয়েছিলেন? ইরাককে উপহার দিয়েছিলেন অর্থনৈতিক রেনেসাঁ? যাকে ভালোবেসে ইরাক থেকে হাজার মাইল দূরে বাংলাদেশের কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামে এক কৃষক তার পুত্রের নাম রেখেছিলেন সাদ্দাম হোসেন?

সাদ্দাম এখনো বেঁচে আছেন। চলমান যুদ্ধের পর জীবিত থাকবেন কিনা, সেটা কেবল বিধাতাই জানেন। সাদ্দাম বেঁচে থাকুক বা না থাকুক, ইতিহাস তাকে ভুলে যেতে পারবে না। যেমন ভুলতে পারেনি কালে কালে যুগে যুগে দজলা-ফোরাত বিধৌত অববাহিকায় জন্ম নেয়া আরো অনেক নৃপতিকে। খ্রিস্টের জন্মেরও ৩ হাজার বছর আগে আজকের ইরাক ভূখন্ডে গড়ে উঠেছিল সুমেরীয় সভ্যতা। গ্রিক, হিটাইট, ক্রিট আর ফিনিশীয় সভ্যতার বহু আগে সুমেরীয়রা বিশ্বকে উপহার দিয়েছিলেন ইট-পাথরের অট্টালিকা, লিখিত আইনকানুন এবং সৃষ্টিশীল সভ্য সমাজ। হাজার বছর ধরে বিকশিত এই সভ্যতার প্রাণশক্তি আরেকটি সভ্যতার উন্মেষে নিঃশেষ হলেও মহাকালের গহ্বরে হারিয়ে যায়নি সুমেরীয় শাসকদের কীর্তি। এরপর এলো সেই বীর্যবান সেমেটিক জাত, ইতিহাস বিশ্রুত ব্যাবিলনীয়রা। ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে উত্তর ও মধ্য ইরাকে বিকশিত এই সভ্যতার এক রাষ্ট্রনায়কের কথা ইতিহাস বিস্মৃত হয়নি। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম শাসক হাম্বুরাবি, খ্রিস্টের ২ হাজার বছর আগে যার আইনে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ ছিল না, ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যিনি প্রণয়ন করেছিলেন কঠোর আইন।

একদা রূপসী বাগদাদ আজ আগ্রাসী আমেরিকার হাতে লাঞ্ছিত

বাথ পার্টির উর্ধতন নেতৃবৃন্দের সাথে সাদ্দাম

এরপর খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দে এলো অসিরীয়রা, পৃথিবীতে প্রথম সুশৃঙ্খল সেনাদল, যাদের হাতে ছিল লৌহ অস্ত্রশস্ত্র আর লৌহগোলক লাগানো ঘোড়ার রথ। তারা পদানত করলো ব্যাবিলনীয়দের। ইরাক থেকে সিসিলি পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ অসিরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী হলো ইরাকের নেনেভ। নেনেভের মরুঝড়ে আজো শোনা যায় অসিরীয় রথের ঘরঘর ধ্বনি।

সম্রাট নেবুচাদনেজারের হাত ধরে পুনর্জন্ম হয় ব্যাবিলনের, গীতবাদ্যমুখর সুন্দরী নিনেভ ধ্বংস হলো। নেবুচাদনেজার নির্মাণ করেছিলেন ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান, অনুপম রাজপ্রাসাদ, জমজমাট ব্যবসা কেন্দ্র ইত্যাদি।

দ্বিতীয়বার ব্যাবিলনের পতন হয় পারস্য সম্রাট সাইরাসের হাতে। ইরাক পরিণত হলো পারস্যের প্রদেশে। কিন্তু ৩৩১ খ্রিস্টাব্দে মহাবীর আলেকজান্ডার পারস্য সম্রাট ডোরিয়াসকে পরাজিত করলে ব্যাবিলন আরেকবার হেসে ওঠে। কিন্তু আরব ভূখন্ড জয়ের প্রস্তুতি গ্রহণকালে সঙ্গীতে মাতোয়ারা এক রাতে আলেকজান্ডার অসুস্থ হয়ে মারা পড়েন। এরপর এলো রোমানরা।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আরব বীর খালেদ বিন ওয়ালিদ মাত্র ৫০০ অশ্বারোহী যোদ্ধা নিয়ে রোমানদের পরাজিত করে ইরাক অধিকার করেন। ইরাক এলো ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। পারস্য, গ্রিক আর রোম সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিণত হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে। আব্বাসীয় শাসনামলে বাগদাদ হলো মুসলিম বিশ্বের রাজধানী। আল-মনসুর, হারুন-অর-রশিদের কথা ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যায়নি। যেমন হারিয়ে যায়নি ক্রুসেড বিজয়ী বীর ইমামুদ্দীন জঙ্গী কিংবা সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর বীরত্ব। এই বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসের জের চালু থাকে বিংশ শতাব্দীতেও। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে জেনারেল আবদুল করিম, কাশেম কিংবা নুরি এস সৈয়দের নাম ভুলে যাবার নয়।

সাদ্দাম হোসেন তাই বিচ্ছিন্ন কেউ নন। তাকে দেখতে হবে ইরাকের দীর্ঘ ইতিহাস এবং নেবুচাদনেজার, সালাহউদ্দীনদের বীরদর্পী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায়। সাদ্দাম দোষে-গুণে মেশানো স্বাধীনচেতা ইরাকি জনগণের প্রতীক। ইতিহাস তাকে যেভাবেই চিত্রিত করুক, বর্তমান পৃথিবী তাকে দেখছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের হুমকির মুখে রুখে দাঁড়ানো এক অকুতোভয় আরব বীর হিসেবে।